PratidhwanitheEcho
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264(Online) 2321-9319(Print)
Impact Factor: 6.28(Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-III, April 2026, Page No.133-139
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.03W.090

ঔপনিবেশিক যুগে বাঙালির নদী গবেষণার ইতিহাস

মহ: আজাহারউদ্দিন, *সহকারী শিক্ষক, পার্বতীপুর জুনিয়র বেসিক বিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*
আসানুর খাতুন, *গবেষক,বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*
হাবিবা সুলতানা, *স্বাধীন গবেষক, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 24.04.2026; Accepted: 27.04.2026; Available online: 30.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Bengal is a land woven from countless rivers. It is difficult to conceive of Bengal without its waterways; indeed, as the distinguished Bengali historian Nihar Ranjan Ray once observed, "The history of Bengal's rivers is, in essence, the history of Bengal itself." These myriad rivers—both large and small—constitute the very life force of Bengal; they are the forces that have shaped the land. These rivers have aptly been characterized as Bengal's "natural wealth." During the colonial era, Major Rennell conducted the first "systematic survey" of Bengal's River systems. The maps he drafted serve as authoritative historical records, enabling us to trace the original courses of Bengal's various rivers. Among the pioneering Bengali researchers of river systems, the name of Radhakamal Mukerjee stands out prominently; he highlighted the river-centric nature of Bengal's economy. He meticulously analyzed how Bengal's political epicenter shifted—anchored as it was to its river systems—moving from the western regions of Maldah and Gaur eastward to Calcutta. Subsequently, another Bengali scholar, Satish Chandra Majumdar, undertook a geo-morphological and epistemological analysis of Bengal's rivers, offering a logical, objective, and scientifically grounded examination of the subject. Furthermore, the renowned Bengali scientist Meghnad Saha made significant contributions through his work on flood management and river dam planning. In essence, this paper attempts to explore and examine the scientific research conducted on Bengal's rivers during the colonial era by these four distinguished Bengalis.

Keywords: River research in the colonial era, Bengali river research, Radhakamal Mukerjee, Satish Chandra Majumdar, Meghnad Saha

ইতিহাসের সাথে ভূগোলের সম্পর্ক থাকলেও ভূগোলকে ইতিহাসের অঙ্গনে পরিবেশনের প্রথম প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় ফরাসি অ্যানাল গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকদের রচনায়।[১] তবে ভারতীয় ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে এই প্রয়াস একেবারে উপেক্ষা করা হয়নি। একটি অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি যে সেই অঞ্চলের মানুষের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে তা অস্বীকার করা যায় না। বাংলা নদী মাতৃকদেশ, নদীকে কেন্দ্র করেই বাংলার আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে উঠেছিল। ঔপনিবেশিক আমলে পাশ্চাত্য জ্ঞানের সংস্পর্শে নদী গবেষণায়অগ্রগতি ঘটেছিল। এই জ্ঞানচর্চার উদ্যোগের হোতা যেমন ছিল ব্রিটিশ সরকার, তেমনি ভারতীয়রা নদী গবেষণায় শামিল হয়েছিল। তবে চরিত্রগতভাবে দুটি উদ্যোগ ছিল পৃথক, ব্রিটিশ শাসকের রাজনৈতিক স্বার্থে নদী গবেষণার

দৃষ্টিভঙ্গির পরিধিসীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ ছিল, তবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রভাবে বিশিষ্ট কিছু বাঙালি নদী গবেষণাক সেই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে জ্ঞান আরোহণ করেছিল।[২] আমরা এই প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে সেই সব বাঙালির নদী গবেষণার ইতিহাস খুঁজে তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

ঔপনিবেশিক আমলে ইংরেজ সাহেবরা মূলত বাণিজ্যিক কারণে বাংলার নদীগুলোকে বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। এই কথাটি একেবারে পুরোপুরি ঠিক নয়, তবে তারা অনেক সময় জ্ঞান অর্জনের জন্যও বাংলার নদীকে বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। তবে ওলন্দাজ বণিকদের উদ্দেশ্য ছিল একেবারেই ভিন্ন, ওলন্দাজদের হাত ধরে বেঙ্গলে আর এক ভিন্ন ধারার নদীচর্চা শুরু হয়। এই চর্চায় প্রথম ও প্রধান ধাপ ছিল মানচিত্র তৈরি করা। নদীর ভৌগোলিক খুঁটিনাটি তুলে ধরা তাদের লক্ষ্য ছিল না।[৩] কারণ তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্যিক স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখা। জোয়াও ডি ব্যারোস (Joao De Barros, 1550) ওগিয়াকোমো গ্যাস্টালডি (Giacomo Gasataldi, 1561) এরা দুইজনেই ছিলেন নদী বিশেষজ্ঞ।[৪] তারা ওলন্দাজ বাণিজ্যিক স্বার্থে নদীর মানচিত্র ও কার্টোগ্রাফার তৈরি করেছিলেন। রেনেল সাহেব বাংলার নদীগুলো সম্পর্কে সর্বপ্রথম 'সিস্টেমেটিক সার্ভে' করেছিলেন।[৫] তাঁর এই মানচিত্র নদীর আদিপ্রবাহে গতিপথ কেমন ছিল তা জানার জন্য একটি প্রামাণ্য দলিল হিসাবে কাজ করে। তারপরে হুগলি নদী নিয়ে অনেক সরকারি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল।এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল Christopher Addams Williams লেখা '*History of the Rivers in the Gangetic Delta, 1750-1918'* [৬] এবং Jemes fergusson এর '*On Recent Changes in the Delta of the Ganges'* [৭] মতো নদী গবেষণার বিষয়।সেইগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রইল নদীকে জানার বহু উপাদান। এমনভাবেই চলেছিল নদীকে জানার কাজ ঔপনিবেশিক পর্বে। ঔপনিবেশিক আমলে ইংরেজ সাহেবরা মূলত বাণিজ্যিক কারণে বাংলার নদীগুলোকে বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। এই কথাটি একেবারে পুরোপুরি ঠিক নয়, তবে তারা অনেক সময় জ্ঞান অর্জনের জন্যও বাংলার নদীকে বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। তবে ওলন্দাজ বণিকদের উদ্দেশ্য ছিল একেবারেই ভিন্ন, ওলন্দাজদের হাত ধরে বেঙ্গলে আর এক ভিন্ন ধারার নদীচর্চা শুরু হয়। এই চর্চায় প্রথম ও প্রধান ধাপ ছিল মানচিত্র তৈরি করা। নদীর ভৌগোলিক খুঁটিনাটি তুলে ধরা তাদের লক্ষ্য ছিল না। কারণ তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্যিক স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখা। জোয়াও ডি ব্যারোস (Joao De Barros, 1550) ওগিয়াকোমো গ্যাস্টালডি (Giacomo Gasataldi, 1561) এরা দুইজনেই ছিলেননদী বিশেষজ্ঞ। রেনেল সাহেব বাংলার নদীগুলো সম্পর্কে সর্বপ্রথম 'সিস্টেমেটিক সার্ভে' করেছিলেন। তাঁর এই মানচিত্র নদীর আদিপ্রবাহে গতিপথ কেমন ছিল তা জানার জন্য একটি প্রামাণ্য দলিল হিসাবে কাজ করে। তারপরে হুগলি নদী নিয়ে অনেক সরকারি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল। সেইগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রইল নদীকে জানার বহু উপাদান। এমনভাবেই চলেছিল নদীকে জানার কাজ ঔপনিবেশিক পর্বে। ঔপনিবেশিক শাসনামলে বাংলায় নদী-বিষয়ক গবেষণার ইতিহাস ভারতের বুকে ব্রিটিশ শাসনের প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রাধিকারগুলোর সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা নদীপ্রণালীর দ্বারা গঠিত একটি ব-দ্বীপ অঞ্চল হওয়ায়, বাংলা তার নদীর জটিল জালিকাব্যবস্থা, ঘনঘন বন্যা এবং কৃষি ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এর গুরুত্বের কারণে বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল।

ঔপনিবেশিক শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে, নদী-বিষয়ক গবেষণা মূলত রাজস্ব সংগ্রহ এবং নৌ-চলাচল সংক্রান্ত প্রয়োজনে পরিচালিত হতো। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নীল,পাট এবং চালের মতো পণ্য পরিবহনের সুবিধার্থে নদীর গতিপথ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের চেষ্টা করত। জরিপকারী এবং প্রকৌশলীরা নদীর গতিপথের বিস্তারিত মানচিত্র অঙ্কন করেন, যার ফলে বাংলার নদীপ্রণালীর অন্যতম আদি ও বৈজ্ঞানিক মানচিত্র

লিপিগুলো তৈরি হয়। 'সার্ভে অফ ইন্ডিয়া'-র মতো প্রতিষ্ঠানগুলো নদীর গতিপথ এবং ভূ-প্রকৃতির পরিবর্তনগুলো নথিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে, নদী-বিষয়ক গবেষণা আরও সুশৃঙ্খল ও বৈজ্ঞানিক রূপ ধারণ করে। ব্রিটিশ প্রকৌশলী এবং ভূগোলবিদরা বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে নদীর রূপতত্ত্ব (morphology), পলি সঞ্চয়ন এবং জলবিজ্ঞান (hydrology) নিয়ে গবেষণা করেন। বাঁধ, খাল এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থার নির্মাণকাজ মূলত এই গবেষণার ওপর ভিত্তি করেই পরিচালিত হয়েছিল; যদিও এই পদক্ষেপগুলোর অনেকগুলোর ফলাফলই ছিল মিশ্র প্রকৃতির। একদিকে যেমন এই ব্যবস্থাগুলো নির্দিষ্ট কিছু এলাকাকে সুরক্ষা প্রদানে সহায়তা করেছিল, তেমনি অন্যদিকে এগুলো প্রায়শই নদীর স্বাভাবিক প্রবাহে ব্যাঘাত ঘটিয়েছিল এবং অন্য এলাকায় বন্যার ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলেছিল।

এই সময়ে বাংলার পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবীরাও নদী-বিষয়ক গবেষণায় সম্পৃক্ত হতে শুরু করেন। ঔপনিবেশিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষিত এই বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ তাঁদের প্রথাগত জ্ঞানের সাথে আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো লেখক ও চিন্তাবিদ এবং পরবর্তী প্রজন্মের গবেষকরা বাংলার ভৌগোলিক ও পরিবেশগত বিভিন্ন দিক—যার মধ্যে নদী এবং তার সাংস্কৃতিক গুরুত্বও অন্তর্ভুক্ত ছিল— সেগুলোর প্রতি গভীর আগ্রহ প্রদর্শন করেন। নদী-বিষয়ক এই গবেষণাগুলো কেবল বৈজ্ঞানিকই ছিল না, বরং তা সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্যমণ্ডিতও ছিল; যা নদী এবং বাঙালি পরিচয়ের মধ্যকার গভীর ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককেই প্রতিফলিত করে।

ঔপনিবেশিক শাসনের শেষলগ্নে এসে নদীর গতিপথের পরিবর্তন, পলি জমে যাওয়া এবং গঙ্গার মতো প্রধান নদীগুলোর গতিপথ সরে যাওয়ার মতো বিষয়গুলো নিয়ে উদ্বেগ ক্রমশ প্রকট হয়ে ওঠে। গবেষক ও প্রশাসকরা এই পরিবর্তনগুলোর কারণ ও প্রভাব নিয়ে বিতর্কে অবতীর্ণ হন এবং এই পরিবর্তনগুলোকে বন উজাড়, জলবায়ুর পরিবর্তনশীলতা এবং মানুষের বিভিন্ন হস্তক্ষেপের সাথে সম্পর্কিত বলে চিহ্নিত করেন।সব মিলিয়ে বলা যায়, ঔপনিবেশিক বাংলার নদী-বিষয়ক গবেষণা তার প্রাথমিক পর্যায়ের ব্যবহারিক ও প্রশাসনিক প্রয়োজন-কেন্দ্রিকতা থেকে বিবর্তিত হয়ে ক্রমশ একটি অধিকতর ব্যাপক ও সমন্বিত বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক গবেষণাক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। এই গবেষণাই এই অঞ্চলে আধুনিক জলবিজ্ঞান চর্চার ভিত্তি স্থাপন করেছিল এবং একই সাথে ঔপনিবেশিক নীতিমালার সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশের জটিল সম্পর্কের বিষয়টিও স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছিল।

এর পাশাপাশি জাতীয়তাবাদি চেতনায় উজ্জীবিতরাধাকমল মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র মজুমদার, মেঘনাদ সাহা এবং নীহাররঞ্জন রায়-এর নদী নিয়ে উৎসাহ বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। এই প্রসঙ্গে এই সব বিশিষ্ট বাঙালিদের নদী নিয়ে কাজের বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে-

রাধাকমল মুখোপাধ্যায়:

লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও সমাজ বিজ্ঞানের অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়কে 'সোশ্যাল ইকোলজির' (Social Ecology) জনক বলা হয়। তিনি প্রথম Social Ecology নিয়ে সিস্টেমেটিক কাজ করেছিলেন।[৮] তাঁর নদী গবেষণার উল্লেখযোগ্য কাজ হল'The Changing face of Bengal: A Study inRiverine Economy'। তিনি এই গ্রন্থে অর্থনীতির গণ্ডি অতিক্রম করেনদী ও মানুষের মৌলিকসম্পর্ক নিয়ে আলোকপাত করেছেন।[৯] এই গ্রন্থের আলোচনার শুরুতে নদী অববাহিকার জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা ও অনুবাহ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি নদী-বনভূমি, জমি ও মানুষ (Environment-Function-organism triad) সব কিছুকে প্রাকৃতির

ভারসাম্যের এক সূত্রে গাঁথা বলে মনে করতেন। কোন একটিকে বাদ দিয়ে অপর একটিকে সম্পূর্ণভাবে বোঝা অসম্ভব।[১০] রাধাকমল মুখোপাধ্যায় সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন- গঙ্গা নদীর সার্বিক স্বাস্থ্যের সাথে উপত্যকার অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক বসবাসকারী মানুষের জীবন-জীবিকা জড়িত। কিন্তু যেভাবে প্রাকৃতিক নিয়মকে উপেক্ষা করে উত্তর ভারতে ক্যানেল, বাঁধ, রাস্তা ও রেলপথ টানা হয়েছে, তা যে শুধু নিম্ন উপত্যকার ব-দ্বীপ অঞ্চলের মানুষের ক্ষতি করছে তা নয়, ভারতীয় সভ্যতা যে গঙ্গাবাহিত উর্বর পলিমৃত্তিকার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল, তাঁর মতে এই অববাহিকার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে চিরদিনের মতো পঙ্গু করে দিচ্ছে।[১১] তিনি মনে করতেন মানুষ যদি প্রকৃতিকে বশে আনতে চায় তাহলে প্রথমে প্রকৃতির চরিত্রকে ভালোভাবে চিনতে হবে। অযাচিতভাবে প্রাকৃতিক নিয়মকে উপেক্ষা করেনদীওপর হস্তক্ষেপ অববাহিকা অঞ্চলে সর্বনাশ ডেকে আনে। তিনি নদী ও মানুষের সম্পর্ক নিয়ে যে তত্ত্ব দিয়েছেন তা ঔপনিবেশিক আমলের উইলিয়াম উইলকক্স সাহেবের ধারনার সাথে অনেক মিল পাওয়া যায়।

সতীশচন্দ্র মজুমদার:

সতীশচন্দ্র মজুমদার ১৮৮৪ সালে বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯০৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে বি.এস.সি পাস করে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পি.এইচ.ডি করেন। ১৯১০ সালে দেশে ফিরে ঔপনিবেশিক সরকারের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসে কাজ শুরু করেন। দীর্ঘ কয়েক দশক কাজ করার পরে ১৯৪২ সালে মাদ্রাজ ও বেঙ্গল সরকারের সেচ দপ্তরের প্রধান হিসাবে কাজ থেকে অবসর নেন।সতীশচন্দ্র মজুমদার যৌথভাবে গোদাবরী পরিকল্পনা নিয়েঅ্যাডামস্ উইলিয়মস-এর সাথে কাজ করে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। তাছাড়া তিনি ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা রুপায়নের অন্যতম পরামর্শদাতা ছিলেন।[১২] ১৯৪২ সালের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডারশীপ বক্তৃতার তাঁর বিষয়বস্তু ছিল- 'Rivers of the Bengal Delta'। এই বক্তৃতাতে তিনি অন্তর্দেশীয় নদী সমস্যা,বেঙ্গলের বিভিন্ন নদীর সমস্যা, নদীর মৃত্তিকা ও স্বাস্থ্য জনিত সমস্যা, অন্তর্দেশীয় নদী কমিশন, গঙ্গা নদী কমিশন, বন্যা ও ভাঙন নিয়ে বিস্তারিত মতামতরেখেছিলেন।[১৩] তাঁর মূলবক্তব্য ছিল- বনাঞ্চল নির্মূল, জনবসতি বৃদ্ধি, সেচের জলের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে নদীর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে, এই প্রসঙ্গে তিনি বারবার নদী ও মানুষের সম্পর্ক নিয়ে সাবধানবাণীশুনিয়েছিলেন। তিনি চাহিদা অনুযায়ী নদীরজলের সুষমা বণ্টনের পক্ষপাতি ছিলেন। এই জন্য প্রত্যেক রাজ্যস্তরে নদী কমিশন গঠনের পক্ষপাতি ছিলেন। তবে তিনি নদীর স্বাভাবিক জীবনের উপর নির্বিচারে হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিলেন। আর নদী অববাহিকা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি নদী গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের কথা বলেছিলেন।

মেঘনাদ সাহা:

উনিশ শতকের মধ্যভাগে ভারতে রেলপথ নির্মানের ফলে দেশের ব-দ্বীপ অঞ্চলে নদী প্রবাহ বিঘ্নিত হওয়ায় নদী ব্যবস্থায় বিপর্যয় নেমে আসে। ঔপনিবেশিক আমলে জাতীয়তাবাদী অর্থনীতি বিকাশের স্বার্থে মেঘনাদ সাহার মতো ব্যক্তিরা নদী নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করেন। মেঘনাদ সাহার নদী গবেষণা নিয়ে উৎসাহের পরিচয় পাওয়া যায় বোম্বে সায়েন্স কংগ্রেসের অধিবেশনে। এই অধিবেশনের মূল সভাপতি ভাষণে তিনি নদী বিজ্ঞান গবেষণার দাবি জানিয়েছিলেন।[১৪] আর ১৯১৩ সালের দামোদর উপত্যাকায় ভয়াবহ বন্যার অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর মনে বন্যা ও নদী নিয়ে জানার আগ্রহ সঞ্চারিত করেছিল।[১৫] মডার্ণ রিভিউ পত্রিকাতে উত্তরবঙ্গের বন্যা নিয়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ মতামতপাওয়া যায়। ১৯৩৮ সালে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের সভাপতি ভাষণে তিনি ভারতের নদী সমস্যার কথা বলেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি বদ্বীপ অঞ্চলের মাটির প্রকৃতি সম্পর্কে গবেষণা করেন। এমনকি বদ্বীপ অঞ্চলে অবস্থান হওয়ার কারণে কলকাতা নগরীকে নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রভাবে মেঘনাদ সাহা নদী পরিকল্পনা নিয়ে ভাবতে শুরু করেন।

মেঘনাদসাহা ১৯৪৪ সালে জুলাই মাসেটেনেসী ভ্যালীর অনুকরণে 'সায়েন্স অ্যান্ড ক্যালচার' পত্রিকাতে তাঁর 'প্ল্যানিং ফর দ্যা দামোদর ভ্যালী' প্রবন্ধে (কমলেশ রায়-সহ) দামোদর পরিকল্পনা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত রাখেন।[১৬] স্বাধীনতার পরবর্তী কালে মেঘনাদ সাহা-র তত্ত্বাবধানেবহুমুখী নদী পরিকল্পনা হিসাবে দামোদর পরিকল্পনা (দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন) বাস্তবায়িত হয়েছিল।তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় স্বার্থে নদী পরিকল্পনা করা। তিনি ঔপনিবেশিক আমলে দেশের সার্বিক স্বার্থে অর্থনীতিক উন্নয়ন ও জাতিরাষ্ট্র পুনর্গঠনের কথা ভেবেছিলেন।

নীহাররঞ্জন রায়:

বাংলার নদীর ইতিহাস রচনায় ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় প্রধান পুরোধা পুরুষ ছিলেন। তিনি প্রথম বলেছিলেন, বাংলার নদীগুলির ইতিহাসই আসলে বাংলার ইতিহাস।[১৭] তিনি- 'বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব' গ্রন্থে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বাংলার নদ-নদীনিয়ে আলোচনা করেছেন। তবে এই গ্রন্থটি বাংলার সামগ্রিক ইতিহাস জানতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাআছে। তিনি বাংলার ইতিহাসে নদ-নদী, রাষ্ট্র, রাজবৃত্ত, শ্রেণী, বর্ণ, ভূমি, ধর্মকর্ম, জীবনযাপন, গ্রাম ও নগর, ভাষা-সাহিত্য-শিক্ষা, শিল্পকলা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলার নদ-নদী নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বাংলার নদ-নদীর প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে বলেন-'বাঙলার ইতিহাস রচনা করিয়াছে বাঙলার ছোট-বড় অসংখ্য নদনদী। এই নদনদীগুলিই বাঙলার প্রাণ: ইহারাই বাঙলাকে গড়িয়াছে'।[১৮] এই নদনদীকে 'প্রাকৃতিক ধনসম্পদ' বলে আখ্যা দিয়েছেন। তার গ্রন্থে নদীর আলোচনায় এসেছে- গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, ভাগীরথী, অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ, তিস্তা, জলঙ্গি, ভৈরব, পুনর্ভবা, মহানন্দা, আত্রাই প্রভৃতি। তিনি বাংলার অসংখ্য ছোট-বড় নদী নিয়ে আলোচনা করেছেন। নদীর আদি ইতিহাস জানতে তার নদী নিয়ে আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ঔপনিবেশিক আমল থেকে গবেষণার কাজ শুরু করলেও স্বাধীনতার পরবর্তীকালে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন।এই প্রবন্ধের আলোচনার সময়সীমাঔপনিবেশিক পর্ব হওয়ায়, আমারা তার ঔপনিবেশিক পর্বে নদী নিয়ে কাজের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার চেষ্টা করলাম।

ঔপনিবেশিক আমলে ব্রিটিশ শাসকের স্বার্থে ও লাভের উদ্দেশ্যে নদী গবেষণার বিকাশ ঘটেছিল। সতেরো শতকের শুরু থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ব্রিটিশ নদী বিশেষজ্ঞদের দ্বারা নদী নিয়ে আঁকা ছবি, নকশা, চার্ট, আদি গতিপথ ও গতিপথের বদল নিয়ে যে জ্ঞান আরোহণ করি তাতে সাহেবদের বিরাট ভূমিকা ছিল। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পরে রেলপথের বিস্তার না জলে স্টিমার, এই দুইয়ের দ্বিধাদণ্ড কাটিয়ে ব্রিটিশ সরকার নদী পথের বিপক্ষে গিয়ে রেলপথের বিস্তারের পথে এগিয়ে যায়।[১৯] উনিশ শতকের পরে ভারতে জাতীয়তাবাদী নদী গবেষণার বিস্তার ঘটেছিল। জাতীয় জীবনধারায় রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রথম নদী ও মানুষের সম্পর্ক নিয়ে প্রসংশনীয়কাজ করেছিলেন। আর এক বাঙালি সতীশচন্দ্র মজুমদার ব্রিটিশ সরকারের অধীনে মাদ্রাজ ও বাংলা প্রদেশের সেচদপ্তরের প্রধান হিসাবে নানাবিধ নদী পরিকল্পনাতে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন।জাতীয়তাবাদী চেতনাতে উজ্জীবিত মেঘনাদ সাহা দামোদর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন। তবে দামোদর পরিকল্পনা নিয়ে অনেকসমালোচনার অবকাশ আছে।সবশেষেঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়-এর আলোচনাতেনদী ও বাংলার ইতিহাসকে নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাংলার অসংখ্য নদীর ভূমিকার কথা স্মরণ করে বলেছিলেন- নদীগুলোর ইতিহাসই হলোআসলে বাংলার ইতিহাস।

উপসংহার:

ঔপনিবেশিক আমলে ব্রিটিশ সরকারের রেলপথের বিস্তার ও বিভিন্ন নদ-নদী পরিকল্পনা নিয়ে যথেষ্ট সমালোচনার অবকাশ আছে। রেলপথের বিস্তারের ফলে সড়কপথের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে জলপথের গুরুত্ব হ্রাস পায়। নদী পথের ব্যবহার কমে গেলে অনেক নদী সময়ের সঙ্গে হারিয়ে যেতে সাথে কিংবা শুকিয়ে যায় বা মরে যায়। ঔপনিবেশিক আমলে দামোদর পরিকল্পনা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল, কিন্তু প্রস্তাব কার্যকারি হয় ১৯৪৭ সালের পরে। এই পরিকল্পনাতে মেঘনাদ সাহা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এই পরিকল্পনা পরবর্তীকালে বিরাট সমালোচিত হয়েছিল, কপিল ভট্টাচার্য দামোদর পরিকল্পনা ও কলকাতা বন্দর সম্পর্কেবিজ্ঞানসম্মতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনিদামোদর পরিকল্পনা নিয়ে জানিয়েছিলেন- দামোদর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে ভবিষ্যতে কলকাতা বন্দর ধ্বংস হবে। এর ফলে দক্ষিণবঙ্গে ভাগীরথী ও হুগলি নদীতে প্রতিবছর বন্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। তাঁর ভবিষ্যৎ বাণী অনুযায়ী কলকাতা বন্দর ১৯৬০ সালের মধ্যে ধ্বংস না হলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে আজ বাস্তব সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[২০] ঔপনিবেশিক আমলের ভুল নদীনীতির জন্য বাংলাকে অনেক খেসারত দিতে হয়েছে, যা আজও ভীষণ প্রাসঙ্গিক। আমরা উন্নায়নের নামে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিরোধী নানা পরিকল্পনা নিতে থাকি, কিন্তু বাস্তবিকভাবে প্রকৃতিকে তার মতো করে বুঝে মানব কল্যাণের কাজে বিজ্ঞান ও টেকনিককে কাজে লাগাতে হবে। আর আধুনিক চিন্তাধারাতে প্রকৃতিকে কন্ট্রোল নয়, সেই সহাবস্থানের কথায় বারবার স্বীকার করা হচ্ছে। কিন্তু ঔপনিবেশিক আমলে বাংলার বিভিন্ন নদ-নদী পরিকল্পনা করার সময় সেটা সবসময় মানা হয়নি।

তথ্যসূত্র:

১. ব্লক,মার্ক। ইতিহাস-লেখকের কাজ, (The Historian's Craft)। অনু. আশিষ কুমার দাস, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ix।

২. চট্টোপাধ্যায়, সব্যসাচী ওরাজবংশী, সুজিত। ঔপনিবেশিক ভারতে বিজ্ঞান সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ১১৬।

৩. Rennell, James. Memoir of a Map of Hindoostan. Printed by M. Brown, London, 1788.

৪. কর্মকার, সুপ্রতিম। নদীজীবীর নোটবুক। ধানসিঁড়ি প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ১৬৯।

৫. Williams, Christopher Addams. History of the Rivers in the Gangetic Delta. 1750-1918, Bengal Secretariat press, 1919.

৬. Fergusson, Jemes. 'On Recent Changes in the Delta of the Ganges'.University of California-san Diego, January 30, 2017. http://jgslegacy.lyellcollection.org

৭. কর্মকার, সুপ্রতিম।প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৯।

৮. 'The American journal of sociology' London and Bombay, Longmans, Green and Co.Ltd, 1945, PP. Viii, 364.

৯. Mukherjee, Radhakamal. The Changing Face of Bengal: A study in Riverine Economy. University of Calcutta, 1938.

১০. মুন্সী, সুনীল কুমার।চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ (সম্পাদনা)।নদী তুমি কার?সাহিত্য সমাজ ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ১৫০।

১১. তদেব, পৃ.১৫০।

১২. তদেব পৃ. ১৫১-৫২।

১৩. Majumder, Satish Chandra. Rivers of the Bengal Delta, Readership Lectures, University of Calcutta, 1941.

১৪.করমহাপাত্র, সুর্যেন্দুবিকাশ। মেঘনাদ সাহা জীবন ও সাধনা। শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৫২।

১৫. তদেব, পৃ. ৫২।

১৬. তদেব, পৃ. ৫৭।

১৭.রায়, নীহাররঞ্জন। বাঙ্গালীরইতিহাস আদি পর্ব। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪০০ বঙ্গাব্দ।

১৮. তদেব, পৃ. ১০।

১৯.কর্মকার, সুপ্রতিম। প্রাগুক্ত, পৃ.৮।

২০.ভট্টাচার্য, কপিল। বাংলাদেশের নদনদী ও পরিকল্পনা। এ.পি.ডি.আর, কলকাতা, ১৯৫৯, পৃ. ১২।